সেই সাতাশ এই সাতাশ

সাপ্তাহিক ২০০০ দেশের শত্রু মিত্র চিহ্নিত করতে চায়

শাহাদত চৌধুরী

সাপ্তাহিক ২০০০ পাঁচ বছর পেরিয়ে ছয়ে পড়লো। আমার সাতাশ বছর বয়সে বিচিত্রায় চাকরি। সেই সাতাশ নিয়ে সাতাশ বছর ধরে তাতে বহাল থেকে দুই সাতাশের যোগফলের বয়সে ২০০০-এর কাজ শুরু করলাম। এ সময় শেষ সাতাশটাকে ঝেড়ে ফেলে নিজেকে পুরনো সাতাশে ফেরা যায় কিনা সেটা ভাবতে গিয়ে দেখা গেলো উল্টো দৌড় আমাকেই নিয়ে যাচ্ছে ইতিহাসের প্রাচীনতায়, স্মৃতিতে, স্থবিরতায়, নিঃস্বতায়।

অনুজপ্রতিম বন্ধু মিডিয়া ওয়ার্ল্ডের পক্ষে প্রকাশক মাহফুজ আনাম প্রথম আলোচনাতেই আমাকে আরো শক্ত কথায় ফেরালেন। বললেন, পুরনো কথা জাস্ট ভুলে যান। আপনার পাঠক কিন্তু নতুন প্রজন্ম। তারা পেছনে তাকাবে না। আমরা চাইবো শাহাদত চৌধুরীর অভিজ্ঞতা। তার সঙ্গে থাকবে আপনার সবচে' বড় অস্ত্র স্বাধীনতা। আগেরটা তো ছিল সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি পত্রিকা। আপনি চোর-পুলিশ খেলেছেন। এখানে আপনি স্বাধীন। যা ইচ্ছে লিখতে পারবেন। এখানে সেন্সর হবে না। এটাকেই শক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

চুয়ান্ন বছর বয়সে সাতাশে ফেরার চিন্তা মাথা থেকে নামলো। কিন্তু সাময়িকপত্র মানে দিনান্তের চালচিত্র শুধু নয়, এর চারিত্র্য মূলত সমসাময়িকতা। এবং সময়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কয়েক ধাপ ওপর থেকে দেখা। ইতোমধ্যে কয়েকজন তরুণ সম্পাদক দৈনিক পত্রিকার জগতে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিয়েছে। সেটা ঘটিয়েছে দৈনন্দিনকতার সঙ্গে সাময়িকপত্রের সমকালীনতাকে সংযুক্ত করে। শুধু সংবাদ নয়, সংবাদকে ছাড়িয়ে গিয়ে পাঠককে এগিয়ে নিতে চাইছে। এছাড়া উপায় নেই। কারণ ইনফরমেশন হাইওয়েতে উঠে অশ্বারোহী হলে লাভ নেই।

এই সব মাথায় রেখে আমার পুরনো কাগজের সবচে' তরুণ কয়েকজনের সঙ্গে বসলাম। কারো বয়স পঁচিশের বেশি নয়। সবচে' সিনিয়র মিজান কেবল পাস করেছে এমএ। অন্যরা সবাই ছাত্র। সিনিয়রদের মধ্যে আমি ছাড়া আছেন আনন্দ বিচিত্রার অরুণ চৌধুরী। কারণ রম্য পত্রিকা পরিচালনার জন্য তার মত সহকর্মী প্রয়োজন। আর ম্যানেজমেন্টের থেকে এলো শামসুল আলম। বিচিত্রায় তার অবস্থান খুব ওপরে ছিল না। কিন্তু প্রকাশনা ক্ষেত্রে খুবই ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সাতাশের নিচে যারা বসলো তারা হলো মিজানুর রহমান, ফারিয়া হোসেন, মোহসিউল আদনান। গোলাম মোর্তোজা বললো, আপনি যদি পত্রিকা বের করেন তবে আর কোথাও জয়েন করবো না। আমি বললাম, তুমি এখনই জয়েন করো না।

আমি আগে যেখানে কাজ করেছি সেখানে এই পর্বটি চলেছিল সাতাশ বছর আগে। দেখলাম জগতটা পুরোপুরি বদলে গেছে। এখন পত্রিকা পুরোপুরি ইন্ডাস্ট্রি। এখানে পা ফেললে পিছোবার পথ নেই। মুখোমুখি হতে হলো দি মিডিয়া ওয়ার্ল্ড বোর্ডের। তারাও চাইলেন পুরনো পত্রিকার 'ভূত'টি কাঁধ থেকে নামাতে হবে। কারণ আমাদের প্রস্তাবিত নাম ছিল **বিচিত্রা ২০০০**। সামনে আমরা প্রবেশ করতে যাচ্ছি পরের শতাব্দীতেই শুধু নয়, সেটা হবে আরেক সহস্রাব্দেরও সূত্রপাত। এতো বড় ক্রান্তিকালকে আমরা এই নামে চিহ্নিত করে রাখতে চাইলাম। অনেক আলোচনার পর **বিচিত্রা ২০০০** নামই ঠিক হলো। সেইভাবে চিঠিপত্র লেখা হলো একদিকে, অন্যদিকে এগিয়ে চললো সরকারের কাছে পারমিশন নেয়ার কাজও। কিন্তু শেষ পর্যায়ে এসে সে সময়ের তথ্যমন্ত্রী আবু সাইয়িদ ফাইল ধরে রাখলেন। তার আপত্তি 'বিচিত্রা' নাম দেয়া যাবে না। আমরা দেখলাম কয়েক মাসে বিচিত্রার অন্য কিছু সংযুক্ত করে বেশ কয়েকটা পারমিশন দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল, শাহাদত চৌধুরীর নাম যেখানে যুক্ত সেখানে বিচিত্রা নামটা কোনোভাবে দেয়া হবে না। এদিক দিয়ে নতুন করে নতুন নামে দরখাস্ত দিলে আমার অনেক সময় চলে যাবে। তখন রফা হলো আমরা বিচিত্রা নামটা বাদ দিয়ে শুধু '২০০০' নামেই পত্রিকা বের করবো।

নির্ধারিত তারিখের ৬ সপ্তাহ পর ২০০০-এর আত্মপ্রকাশ ঘটলো ১৫ মে, ১৯৯৮। আশ্চর্য এক 'কো ইন্সিডেন্স'। বিচিত্রার প্রকাশ তারিখও মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। ২৭ বছর পর নতুন করে শুরু হলো ১৮ মে-তে। এদিকে 'বিচিত্রা' নামটাই লুট হয়ে গেল, চলে গেলো পারিবারিক দখলে। ফলাফল : একটি ইনিস্টিটিউশনের, একটি স্বপ্নের মৃত্যু।

পাঠকও বদলে গেছে। পুরনো পাঠকের মাপকাঠি তো একটিই। বিচিত্রার চেয়ে ভালো বা মন্দ। দেখা গেল যারা ২০ বা ২৫ বছর ধরে

বিচিত্রা পড়েছেন তারা জানালেন ব্যক্তিগত মতামত : না, বিচিত্রার মতো হচ্ছে না। কেউ কেউ বললেন, আহা এমন ছাপা যদি বিচিত্রার হতো।

নতুন পাঠক প্রজন্ম জানালো, তারা কি কি চায়।

এরা বাংলাদেশ শুধু নয়, স্পর্শ করতে চায় বিশ্বকে। এরা ইনফরমেশন হাইওয়ের পথিক। পরিব্রাজক। এরা স্বপ্ন দেখে না দেশ নিয়ে। আপত সমীক্ষণে মনে হলো এরা স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করে নিজের প্রতিষ্ঠা নিয়ে। একদা পত্রিকায় আমরা স্বপ্নের ফেরি করতাম। এখন স্বপ্ন ফেরিওয়ালার সেই হাঁক নতুন প্রজন্মের কান পর্যন্ত পৌঁছায় না।

সাপ্তাহিক ২০০০ বের হবার কয়েক মাসের মধ্যে সিনিয়র মিজান চলে গেল জার্মান বেতারে চাকরি নিয়ে। আদনান ও মোর্তোজা তখন ছাত্র। ওরাই হাল ধরলো। এবার মুখোমুখি হলো নতুন পাঠকদের সঙ্গে আরো কিছু নতুনদের নিয়ে। স্বাধীনতা-উত্তর কালে হাইজ্যাক-রাহাজানি-সামরিক অভ্যুত্থানের পরও স্বপ্ন ছিল। পুকুরের মাছ চাষ পদ্ধতি বা একটি মুরগির খামারের বাজেট কি হতে পারে, নগর ভার্টিক্যালি বাড়বে না ছড়িয়ে যাবে দিগন্ত প্রসারিত করে, ইউক্যালিপটাস নয় কাঁঠাল, আম গাছ উপকারী- এসব নিয়ে ভাবনা অজান্তে তখন হারিয়ে গেছে। কারণ গণতন্ত্রের অপেক্ষায় থেকেছে মানুষ। জনতার অভ্যুদয় ঘটেছে নব্বই দশকে। তারপর বদল হয় না কিছু। স্বপ্নের চেয়ে একটি দলের ছত্রছায়ায় দাঙ্গাবাজ বা চাঁদাবাজ মাস্তান হওয়া লাভজনক ব্যবসা। সেশনজট, ক্যাম্পাসের সন্ত্রাসে নতুন প্রজন্ম পাড়ি দিতে চায় দূরে কোথাও। স্বপ্নেরা দানা বাঁধে না কোথাও।

এক বিপন্ন সভ্যতার মুখোমুখি হলাম কি? মনে হয় না। এই জাতির মাথায় দুষ্টক্ষত দেখা গেলেও জনগণ সব সময় দেশের সতর্ক প্রহরী। এটা আমার অভিজ্ঞতা, আমার বিশ্বাস। নেতৃত্ব শেষ মুহূর্তে অগ্রভাগ থেকে সটকে পড়েছে ইতিহাসের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে, তখন জনগণকেই দেখা গেছে অগ্রভাগে। সেটা ৫২ সাল বলুন, আর একাত্তরে বলুন।

পঁচিশ বছরের নতুন প্রজন্মের কর্মীদের সামনে আরো সমস্যা। বাহাত্তর সালে এদেশের মানুষ ছিল সাত কোটি, এখন তা দ্বিগুণ হয়েছে। তখন খাদ্যের অভাব ছিল। একটি মন্বন্তরে মারা গিয়েছিল কয়েক লাখ মানব সন্তান। এখনকার কৃষক চোদ্দ কোটি মানুষের খাদ্য উৎপাদন করছে।

মেয়েরা অর্থনীতির হাল ধরেছে। প্রাচীন গ্রামীণ কাঠামো ভেঙে ফেলেছে কিন্তু নেতৃত্বের অভাবে নতুন কাঠামো গড়তে পারছে না। তখন সরকার টিসিবি খুলে ব্যবসায় ব্যস্ত থেকেছে। সুতো না এনে কাপড় আমদানি করছে, ক্যাটেল ফুড না এনে গুঁড়ো দুধ এনে শেষ হয়েছে এ দেশের তাঁত, পারিবারিক গো মহিষ পালন। এখনকার তরুণ উদ্যোগীরা জানিয়েছে আপনাদের কিছু করতে হবে না। আপনাদের দায়িত্ব, আপনারা পালন করুন: শান্তি-শৃঙ্খলা ঠিক বজায় রাখুন পুলিশ বাহিনীকে ঠিক করুন জনগণই নির্মাণ করবে এদেশ। মাস্তানি বন্ধ করুন, গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠবে খামার। এনার্জি, গ্যাস ইলেক্ট্রিসিটি ঠিক করুন গড়ে উঠবে ইন্ডাস্ট্রি। ঠিক করুন ট্যাক্স-ট্যারিফ। যাতায়াত সহজ হোক রেলওয়ে ঠিক করুন। চোরাচালান বন্ধ করুন। দেশের শিল্পই সুলভে পাবে মানুষ।

এখন সরকার টিসিবি জাতীয় অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। কিন্তু আমলাতন্ত্রও নড়ছে না। ফাইল আটকে যায় এখানে-সেখানে। ওদিকে মুক্ত বাজার অর্থনীতি। ট্যাক্স ব্যবস্থা এমন যে, একজন উৎপাদক প্রথমে উৎপাদিত দ্রব্য বিদেশে দেয়, আবার সেটাই আমদানি করে। কারণ দেশে সরাসরি বিক্রি করলে দাম বেশি পড়ে যায়। বিদেশ ঘুরে এলে বিদেশী জিনিস হলো এবং শুধু ভ্যাট দিয়েই বাজারজাত সস্তায় করা গেলো।

যেখানেই বাংলাদেশ অগ্রসর হচ্ছে যেখানে সরকারের হাত কম বলেই ধরে নেয়া যায়। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন মোড় নিয়েছে। যে সেক্টরে অর্থায়ন ঘটবে সেখানেই সরকার নয়, নেমে পড়ছে ওপর কাঠামোর আত্মীয়স্বজন তাদের পরিবার নিয়ে।

স্বপ্ন সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে কি?

তাও মনে হয় না। নতুন প্রজন্ম বরং আমাকে স্বপ্নের ঘোর থেকে বের করে এনেছে। এরা ইতিহাসের নতুন পরিব্রাজনে এক বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এদের সবার জন্ম মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে, স্বাধীন দেশে। এরা ঘাতক দালালদের চেনে। এদের বিনাশ চায়, মৌসুমী স্লোগানে বিশ্বাসী নয়। এরা চেনে লুটেরাদের, মাফিয়া চক্রকে। তাদের দলবদ্ধ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে সাহসের সঙ্গে। এদের ধমকের কাছে নত হয় না। এ প্রজন্ম চিহ্নিত করে বিবৃতিবাজ কলম সন্ত্রাসীদের মাস্তান মাফিয়াদের সঙ্গে। এরা বলে ব্যক্তি বা দলের চেয়ে দেশ বড়। এরা চিহ্নিত করে কোটিপতি ঋণ খেলাপীদের। কিভাবে জঙ্গি বিমান কেনা হয় এরা তা জানে, জানে চীন সফরে কারা কারা সফর সঙ্গি হয় এবং কেন হয়।

নতুন প্রজন্ম বরং আমাকে স্বপ্নের ঘোর থেকে বের করে এনেছে। এরা ইতিহাসের নতুন পরিব্রাজনে এক বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এদের সবার জন্ম মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে, স্বাধীন দেশে। এরা ঘাতক দালালদের চেনে। এদের বিনাশ চায়, মৌসুমী স্লোগানে বিশ্বাসী নয়। এরা চেনে লুটেরাদের, মাফিয়া চক্রকে। তাদের দলবদ্ধ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে সাহসের সঙ্গে। এদের ধমকের কাছে নত হয় না। এ প্রজন্ম চিহ্নিত করে বিবৃতিবাজ কলম সন্ত্রাসীদের মাস্তান মাফিয়াদের সঙ্গে। এরা বলে ব্যক্তি বা দলের চেয়ে দেশ বড়। এরা চিহ্নিত করে কোটিপতি ঋণ খেলাপীদের। কিভাবে জঙ্গি বিমান কেনা হয় এরা তা জানে, জানে চীন সফরে কারা কারা সফর সঙ্গি হয় এবং কেন হয়

এরা জানে দেশের শত্রু কে, মিত্র কে।

২০০০-এর নতুন প্রজন্ম শনাক্ত করে যাচ্ছে দেশের শত্রু এবং মিত্র। যা এখন সবচে' প্রয়োজন।

এরা আমাকে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে নতুন সাতাশ বছরে। পুরনো স্বপ্নের মোহ কাটলেও নতুন স্বপ্ন দেখছে ২০০০-এর নতুন সাতাশরা। এরা পারিবারিক লুটেরার হাত থেকে রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিকে মুক্ত করতে চায়। এরা দাঁড়িয়েছে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এরাও স্বপ্ন দেখতে চায়, জনগণকে স্বপ্ন দেখাতে চায়।

চায় গণতন্ত্রের মুক্তি।